আবু মুয়াজের তাণ্ডবা!

আবু মুয়াজের তাওবা!

ঘটনার শুরুটা এভাবেঃ

দুই ডাকাতের দৃষ্টি তাদের শিকারের দিকে। তারা অন্যান্য বাড়িগুলোর থেকে তাদের দৃষ্টিতে অপেক্ষাকৃত সুন্দর একটি বাড়ি বেছে নিয়ে তার দিকে অগ্রসর হল।

তাদের কাজ ছিল অনেকটাই সহজ ও বিপদমুক্ত, যেহেতু তাদের শিকারগুলো সাধারণত দুর্বল হতো। তারা সাধারণত দিনের বেলায় কাজে বের হতো, যখন ঘরের পুরুষেরা কাজের জন্য বাইরে থাকে। যদি ঘটনাক্রমে ঘরে কোনো পুরুষের সাথে দেখা হয়ে যেত, তখন পালয়ন ছিল সহজ ও পূর্বপরিকল্পিত।

কারণ তখন তাদের শুধুমাত্র যা করতে হতো তা হলো, মনে যে নামটাই প্রথমে আসতো সেই(কাল্পনিক) ব্যাক্তিকে তারা খুঁজছে- এমন ভান করা, এরপর বিরক্ত করার জন্য ক্ষমা চাওয়া, আর বলা যে, নিশ্চয়ই তাদের নিকটে যে ঠিকানা আছে সেটায় ভুল আছে এবং এর পর নিঃশব্দে কেটে পড়া। তাদের এরকম ধোঁকাবাজি করার প্রয়োজন ছিল, কেননা তাদের সাধারণ অস্ত্র কোনো শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কার্যকরী ছিল না।

তারা তাদের পছন্দের বাড়িটির দরজার দিকে অগ্রসর হলো...

তাদের কেউই জানতো না যে, এই দরজাই তাদেরকে আটক করবে কারাগারের কঠোর জীবনে পনের বছরের জন্য। তারা যখন তাদের অস্ত্রগুলো মহিলাটির মুখের দিকে তাক করছিল, তখনোও মনে হয় নি যে, তাদের পরিকল্পনায় চুরি আর ডাকাতি ছাড়া অন্য কিছু ছিল। তারা বহনযোগ্য যা কিছু পেতো সেগুলো নিয়ে যেতো এবং ভালো দামে বেচে দিতো।

কিন্তু আল্লাহর চিরন্তন বিচক্ষণতা ছিল এমন দুর্বল শিকার দিয়ে তাদের পরীক্ষা করা যা তারা সহজেই কাবু করতে পারতো এবং এটাই তাদের উভয়ের পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ালো।

যখন তাদের একজন ঘরের এদিক-সেদিক ছড়িয়ে থাকা ব্যক্তিগত জিনিসপত্রের দিকে তাকাচ্ছিল, সে একটি বন্দুক দেখতে পেলো। সে বন্দুকটি হাতে নিয়ে মহিলাটির দিকে তাকিয়ে বন্দুকটিকে বেপরোয়াভাবে ঝাঁকাতে লাগলো।

...নিঃসন্দেহে, সমস্যাটা ছিল একজন খারাপ বন্ধু বাছাই, হে আবু মুআয। একথা কি বলা হয় না যে, বন্ধু হলো শিকলের মতো? সুতরাং এই বাজে বন্ধুই তোমাকে শিকল দিয়ে টেনে নিয়ে গেলো কারাগারের গভীর পনের বছরের জন্য...

লক্ষ্য করুন কত দ্রুত শয়তান তাদের অন্তরকে প্রভাবিত করলো যখন তারা দেখলো যে, মহিলাটি ভিতসন্ত্রস্ত ভাবে তার বাচ্চাদের আগলে ধরে আছে কারণ বাচ্চাগুলো চিৎকার করছিল ও কাঁদছিলো। মহিলাটি বললো, ''যা চাও নিয়ে যাও এবং আমাকে ছেড়ে দাও।''

যেটির ব্যাপারে মহিলাটি আশংকা করছিল তা কিন্তু তাদের পরিকল্পনায় ছিল না। যাই হোক, কত শিকারের পাখিই না ভুল করে শিকারীর নজরে পড়ে যায় যখন কি না শিকারী হয়তো তাকে পূর্বে খিয়ালই করে নি। বাস্তবিকই, এটা হলো কদর্য কামনা-বাসনা যা কেবল তার উপরই প্রভাব বিস্তার করতে পারে যার অন্তরে আল্লাহ্*র ভয় নেই এবং যার ঈমান দুর্বল হয়ে গেছে এবং এরপর যা ঘটার ছিল তা ঘটে গেলো...

এভাবেই ঘটনার সুত্রপাতঃ কয়েক মুহূর্তের ক্ষণস্থায়ী কামনা-বাসনা সাথে ভয়, আতংক ও অনুশোচনা। এর কারনে তাদের উভয়ই দোষী সাব্যস্ত হলো এবং ডাকাতি ও ধর্ষণের জন্য শাস্তিপ্রাপ্ত হলো। যেহেতু ধর্ষণের শাস্তিটাই ছিল গুরুতর, তাদের কারাগারে যাবার কারণ হিসেবে এটাই পরিচিতি পেলো।

আপনি কি ধরনের অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত তা কারাগারের জগতে আপনার ভাবমূর্তির ক্ষেত্রে বেশ গুরুত্ব ও তাৎপর্য বহন করে। এখানে অভিযোগ সব ধরনের হতে পারে । কিছু অভিযোগ মহৎ আর কিছু অভিযোগ ঘৃণ্য- একজন কারাবন্দী তার অভিযোগ অনুযায়ী গর্ব অথবা লজ্জা বহন করে । কারো মর্যাদার অপরের উর্ধ্বে উন্নীত হয়, আর কেউবা অপরের হাসির পাত্র হয়ে দাঁড়ায়।

দিন যায় , মাস যায় আমাদের বন্ধুটির চুল ধূসর বর্ণ হতে শুরু করলো।

প্রকৃতপক্ষে, কারাগার হল জীবিতদের কবর। যারা এর স্বাদ পেয়েছেন তারা বলেন,

আমরা দুনিয়া ত্যাগ করেছি যদিও আমরা দুনিয়াতেই আছি,
এখানে না আমরা জীবিত আর না আমরা মৃত্যুবরণ করেছি।
একদিন যদি আমাদের বন্দীকর্তা কিছু নিয়ে আসে আমাদের কাছে,
আমারা বিস্মিত এবং বলি, দুনিয়া থেকে একজন ব্যাক্তি এসেছে;
আর আমরা আমাদের স্বপ্নের দ্বারা বিস্মিত হই এবং সেগুলোর কথা বলি
যেহেতু এখন আমাদের আলাপ-আলোচনার উৎস আমাদের এই স্বপ্ন গুলি;
যদি স্বপ্নটি হয় সুন্দর, তবে অতি ধীরবেগে তা হয় প্রস্ফুটিত
আর যদি তা হয় অপ্রিয়, তবে তা হয় শৃঙ্খলমুক্ত এবং দ্রুত বিকশিত;
আমারা আল্লাহ্*র কাছে অভিযোগ করি, যেহেতু তাঁর কাছেই অভিযোগ করতে হয়
আর তাঁর হাতেই রয়েছে সকল বিপর্যয় ও সঙ্কটের নিরাময়...

প্রকৃতপক্ষে এটাই হল কারাগার, আমার বন্ধু। এটা হয় তোমাকে ধ্বংস করবে, তোমকে চেপে ধরবে অথবা তোমার উপকার করবে। কেউ যদি অন্তরে যথেষ্ট পরিমান ঈমান না নিয়ে এতে প্রবেশ করে, তবে সে মৃত হিসেবে গণ্য হবে। এদের ব্যাপারে আল্লাহ্* বলেন,

أَمۡوَٰتٌ غَيۡرُ أَحۡيَآءٖۖ وَمَا يَشۡعُرُونَ أَيَّانَ يُبۡعَثُونَ

তারা নিষ্প্রাণ, নির্জীব এবং পুনরুত্থান হবে, সে বিষয়ে তাদের কোনো চেতনা (বোধ) নেই।

[সূরা নাহলঃ২১]

কেউ যদি এটা থেকে শিক্ষা গ্রহণ না করে অথবা তার হৃদয়ে জীবন সঞ্চার না করে, তবে সে কেবল এক কবর থেকে পরবর্তী কবরে যাবে, এবং এর মাঝে

এক মৃত্যুর থেকে আখিরাতের প্রকৃত মৃত্যুর দিকে যাবে... আর আখিরাতের সেই কারাগার দুনিয়ার এইসব কারাগার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন...

আর দুনিয়ার কারাগারের দিনগুলো একেকটা সপ্তাহের রূপ নেয়, আর সপ্তাহগুলো হয় বছরের মতো, যেখানে কেবল একই জিনিসের পূর্ণরাবৃত্তি ঘটে। একটি দিন হতে পরবর্তী দিনটিতে নতুন কিছুই ঘটে না। মানুষের জীবন এখানে বিফলে যায়, কারণ জীবন তো কিছু সংখ্যক দিনের সমষ্টি মাত্র- যখন একটি দিন অতিবাহিত হয়, আপনার জীবনের একটি অংশ চলে যায়, যেমনটি আল্লাহ্* তা'আলা বলেছেন,

وَالْعَصْرِ

إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ

''কালের শপথ, মানুষ অবশ্যয় ক্ষতির মধ্যে রয়েহে।'' [সূরা আসরঃ ১-২]

এর ব্যাখ্যায় হাসান আল বসরী (রাহিমাহুল্লাহ) যথার্থই বলেছিলেন, ''নিশ্চয়ই মানবজাতি সর্বদা ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত থাকে , যদি না সে আল্লহর দয়ার মধ্যে আচ্ছন্ন হয়।''

আর কারাগারে যে ব্যক্তি জীবন অতিবাহিত করে সে জীবনটা কেমন? এটা এমন একটা জীবন যা মৃত্যুর চেয়েও ভয়াবহ । এখানে একজন মানুষ বেদনা, যন্ত্রণা আর অনুশোচনা ছাড়া আর কিছুই অনুভব করে না। সুতরাং, মৃত্যুই এর চেয়ে শ্রেয়, আর এজন্যই যে ব্যক্তি এর স্বাদ পেয়েছে সে মৃত্যু কামনা করে এবং এর জন্য প্রার্থনা করে...

এরকম শুকনো ও প্রাণহীন বছরগুলো পরিক্রমায় হঠাৎ আমাদের বন্ধুটি তন্দ্রা থেকে জেগে উঠলো। তার চক্ষুদ্বয় সম্প্রসারিত হলো, ঈমানের জ্যোতির আভায় তার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হলো। তার জীবন পরিবর্তন হতে শুরু করলো, তার হৃদয়ে প্রানের সঞ্চার ঘটানো হয়েছিল, আর ব্যাপারটা এরূপ যেন সে নতুন জীবন ফিরে পেলো শুধুমাত্র কিছু তাওহীদপন্থী ভাইদের সংস্পর্শে এসেই...আর আমদের সময়ে তাদের কতজনই না কারাগারে দিন যাপন করছে!

সে এইসব ভাইদের সংস্পর্শে এসে তাদের সাথে চলা শুরু করল যখনই তারা কারাগারে আসতো একাকী বা দলবদ্ধভাবে। একদল চলে গেলে তাদের পরিবর্তে আরেকদল আসতো যাদের মধ্যে সে দেখেছিল সম্মান, অনুগত্য, সঠিক কর্মপদ্ধতি আর নির্ভেজাল ঈমান।

তাদের সাজা ছিল নানা রকমের, কারো ছিল আমাদের বন্ধুটির মতোই কঠোর সাজা, কারো এমনকি তার চেয়েও ভারী ও কঠোর সাজা ছিল। তবুও তাদের মনোবল ছিল সমুন্নত এবং তাদের নাক ছিল আরো ঊর্ধ্বে। তারা আল্লাহ ব্যতীত আর কারো সামনে মাথা নত করতো না।আর তারা দ্বীনের বিনিময়ে কোনো লাঞ্ছনা ও অবমাননা সহ্য করতো না।

তাদেরকে অপবাদ দেয়া হতো চরমপন্থী, সন্ত্রাসবাদী জঙ্গি ও ফিতনা সৃষ্টিকারী হিসেবে। কিন্তু যখন তদেরকে তাদের বিরুদ্ধে কৃত অভিযোগ ও তাদের অপরাদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হতো, তারা দৃঢ়তার সাথে বলতো, ''লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।'' তারা স্পষ্ট প্রমাণ ও যুক্তির দ্বারা এটা ব্যাখ্যা করতো, পরোয়া করতো না কোনো গার্ড, অফিসার বা নির্যাতনকে। তারা এইসব বাতিলপন্থীদের নির্দেশ মেনে নিতে সম্মত হতো না অথবা তাদের রক্তচক্ষুরও পরোয়া করতো না।

গার্ড ও অফিসাররা যখন সকালে রুটিনমাফিক কক্ষ তল্লাশী করতে আসতো তখন তাদেরকে দাঁড়িয়ে সম্মান করা ছিল কয়েদীদের জন্য স্বাভাবিক বিষয় । কিন্তু যখনই এই তাওহীদপন্থী ভাইয়েরা অন্যান্য কয়েদীদের মতো তাদের সম্মান প্রদর্শন করতো না, তখন তারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হতো। ভাইয়েরা তো তাদেরকে কোনো সম্ভাষণই জানাতো না, আর দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন তো দূরের কথা। ফলশ্রুতিতে তারা বিরল কিছু উপলক্ষ ছাড়া তাদের কক্ষ তল্লাশী করতে আসতো না।

তারা তাদের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সামনে অস্বস্তিতে পড়তে চাইতো না যখন তারা এই তাওহীদপন্থী ভইদের সামনে আসতো। কারণ এই ভাইয়েরা তাদের প্রবেশে কোনো মনযোগই দিতো না, বরং তারা যেই বই পড়ছিল অথবা যে

শিক্ষা প্রদান করছিল তাতেই তারা ব্যস্ত থাকতো। এমনকি তারা সামান্য মুখ তুলে ও তাকাতো না অথবা অন্যান্য কয়েদীদের মতো দাঁড়িয়ে যেতো না...
সাবধান! তারা ফাসাদ সৃষ্টিকারী! তারা সন্ত্রাসবাদী জঙ্গি! তারা সমাজ থেকে বহিষ্কৃত!

إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ

নিশ্চয়ই এরা ক্ষুদ্র একটি দল। তার আমাদের ক্রোধ উদ্রেক করেছে। এবং আমরা সকলে সদা সতর্ক।
[সুরা শুআরাঃ৫৪-৫৬]

কিন্তু আমাদের বন্ধুটি তাদের সৃষ্ট এই সব চাপ, প্রচারণা অথবা সতর্কবানীর প্রতি কোনো কর্ণপাত করে নি। এতসব বাধা-বিপত্তি ও সম্ভাব্য পরিণতি সত্ত্বেও আমাদের বন্ধুটি এই আগন্তকদের সাথে একতাবদ্ধ হয়ে রইলো, আর একের পর এক বাধা দূর হতে শুরু করলো।
ভয়-ভীতির বাধা দূরীভূত হলো, কেননা সে সেই শিক্ষা অর্জন করেছিল যেটিকে ইবনুল কাইয়্যুম (রাহিমাহুল্লাহ) আল্লাহ্* ব্যতীত আন্য সকল কিছুর ভয়-ভীতি ও পরম সম্ভ্রম থেকে নিজেকে মুক্ত করা হসেবে অভিহিত করেছেন, এটি দেখতে পাওয়া যায় যখন তাওহীদপন্থীরা আল্লাহ্*র প্রসংশা করে, তার তাঁকে এমনভাবে ভয় করে যার ফলে তাদের সমগ্র সত্তা আল্লাহ্*র প্রতি পরম ভীতি ও সম্ভ্রমে পরিপূর্ণ হয়ে যায় যা তাদের হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে ফেলে সম্পূর্ণরূপে, আর এর ফলে তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো কিছুর প্রতি ভয় প্রদর্শন করতে সম্পূর্ণ অক্ষম হয়ে পড়ে।
সুতরাং, সমগ্র আসমান ও জমিন যে আল্লাহ্*র অধীনে রয়েছে সেই আল্লাহ্*র ভয় তাকে আল্লাহ্*র পরিবর্তে অন্য কারোও ভয় বা প্রশংসা থেকে বিরত রাখলো । সুতরাং, আল্লাহ্*র পরিবর্তে অন্য যেসব কিছুর ভয় বা ইবাদত করা হয়, সেগুলো আসলে কিছুই না, যেমনটি আল্লাহ বলেন,

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا ۖ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ ۖ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

যারা আল্লাহ্*র পরিবর্তে অপরকে অভিভাবকরূপে গ্রহন করে তাদের দৃষ্টান্ত সেই মাকড়সার ন্যায় যে নিজের জন্য ঘর বানায় এবং ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো দুর্বলতম, যদি তারা জানতো!
[সূরা আনকাবূতঃ৪১]

এবং তিনি বলেন,

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

তারা আল্লাহ্*র পরিবর্তে যা কিছুকেই আহবান করে আল্লাহ্* তা জানেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।
[সূরা আনকাবূতঃ৪২]

আর অতীতের অভিযোগের প্রেক্ষিতে তার উপর যে কলঙ্ক ছিল তাও দূরীভূত হলো, কেননা সে ভাইদের কাছ থেকে শিখেছিল যে, পরিপূর্ণ ইসলাম গ্রহণ করলে তা পূর্বের সকল গুনাহ মুছে দেয়, আর ইসলামের পূর্বে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাহাবীদের(রাদিয়াল্লাহু আনহুম) অতীত হত্যা, চুরি ও ধর্ষণ ব্যতীত আর কি ছিল?

কিন্তু যখন তাঁরা ইসলামের মাধ্যমে প্রকৃত একত্ববাদের সম্মানের স্বাদ আস্বাদন করলেন এবং গভীর আত্মমর্যাদা অনুভব করলেন, তখন তাঁরা হয়ে গেলেন জাতি ও জনগণের নেতা, আর তাঁরা এই দুনিয়া ও পরবর্তী জীবনে সম্মান অর্জন করলেন। তাঁরা (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) একের পর এক জমিন জয় করেছিলেন এবং জনগণের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, আর আজ তাদের কে স্মরণ করা হয় সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রজন্ম হিসেবে।

এই সকল প্রতিবন্ধকতা আমাদের বন্ধুটিকে প্রভাবিত করতে পারলো না, বরং সেগুলো নিতান্ত উপেক্ষণীয় বিষয়ে পরিণত হলো, কেননা তার কাছে ভাইদের এই পাঠ সভা, আল্লাহ্*র আয়াতের তেলাওয়াত শ্রাবণ কিংবা তাওহীদের শিক্ষায় নিমজ্জিত হবার চাইতে অধিক প্রিয় আর কিছুই ছিল না। মাত্র কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের বন্ধুটির জীবন পরিবর্তন হয়ে গেলো, আর সে পুরনো বন্ধুদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে তাদের বাতিল রাস্তা পরিত্যাগ করলো, আর কবির এই কথাগুলো দৃষ্টান্ত হয়ে গেলো,

তাঁরা তোমাকে প্রস্তুত করেছে এমন কিছুর জন্য, যদি তোমার তার জন্য বোধশক্তি থাকে, নিজেকে ধ্বংসের হাত থকে রক্ষা করো...
সে বুঝতে পেরেছিল যে, দুনিয়ায় নিছক ঠাট্টা-তামাশা অথবা সময় অপচয়ের জন্য পাঠানো হয় নি। বরং তাকে এখানে একটি মহৎ উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছে যার ব্যাপারে সে পূর্বে অসচেতন ছিল।

সুতরাং, তাকে এখন আর বাকি লোকদের দলভুক্ত করা যায় না যারা সর্বদা ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত থাকে। বরং, সে সেইসব ব্যতিক্রমদের অন্তর্ভুক্ত যাদের ব্যাপারে আল্লাহ্* বলেন,

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

কিন্তু তারা নয় যারা ঈমান আনে ও সৎ আমল করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয়, এবং ধৈর্য ধারণে পরস্পরকে উদ্ধুদ্ধ করে থাকে।
[সূরা আসরঃ৩]

এর ফলে, সে এটা নিয়ে কোন পরোয়া বা আফসোস করতো না যে, তার দিনগুলো কারাগারের মধ্যে অতিবাহিত হচ্ছে। বস্তুতঃ মুমিনদের জন্য পুরো পার্থিব জীবনটাই কি কারাগার নয় যেমনটি আল্লাহ্*র রাসূল(সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের জানিয়ে গেছেন? আর এই জীবনটার স্বরূপ কি? আর

এই দিনগুলো কিরূপ যখন একে তুলনা করা হয় আখিরাতের দিনগুলোর সাথে এবং আল্লাহ্*র কাছে যা আছে তার সাথে?(১)

প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহ্* যদি তাঁর কোননো বান্দার উপর অনুগ্রহ করে তাকে ইসলামের উপর সুদৃঢ় থাকার পুরষ্কারে ভূষিত করেন, এবং ফলশ্রুতিতে সে জাহান্নাম থেকে বেঁচে যায় এবং জান্নাতের বাগিচাসমূহে প্রবেশ করে, তবে সেই তো প্রকৃত সফলকাম! আর এরপর? এরপর জান্নাতের একটি মুহূর্ত তাকে তার সকল যন্ত্রণার কথা ভুলিয়ে দিবে যা সে কারাগারে ভোগ করেছে। যদি এভাবেই তার জীবনটা শেষ হয়, তবে কোনো ক্ষতি আছে কি?

হ্যাঁ সত্যিই তাই, একজন ব্যক্তির জীবন সবচেয়ে চমকপ্রদ পরিবর্তন আনে তার ঈমান। এটি সেভাবেই একটি কঠিন পরীক্ষাকে অনুগ্রহে রূপান্তরিত করে ঠিক যেভাবে আপনার নিকট খুব অপছন্দনীয় একজন ব্যক্তি হয়ে যায় আপনার ভালোবাসার পাত্র। এটি নির্যাতনকে মধুরতায় রূপান্তরিত করে ঠিক যেভাবে দুঃখ-দুর্দশা পরিণত হয় আশীর্বাদে, আর এটি কেবল নিছক কিছু কথার মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে অর্জন করা যায় না।

বরং, এটা সম্ভব হয় শুধুমাত্র গায়েবের প্রতি ঈমান আনার মাধ্যমে এবং শেষ পর্যন্ত ধৈর্য, অবচলতা ও পরিশোধনের চেষ্টার মাধ্যমে যতক্ষণ পর্যন্ত না একজন মুমিন বান্দা সকল পাপ ও কলঙ্ক হতে পবিত্র ও মুক্ত হয়ে যায় ঠিক যেমন স্বর্ণকে আগুনের মাধ্যমে ত্রুটিমুক্ত করে নির্ভেজাল খাঁটি স্বর্ণে রূপান্তরিত করা হয়।

এবং নিজেকে বলো আনন্দ আহরণ করতে এক ঘণ্টার ধৈর্য দ্বারা
পরিশেষে যারা কঠোর পরিশ্রম করেছিল তারা ক্লান্তি ভুলে যাবে
এটা তো কেবল একটি ঘণ্টা মাত্র, আর তা শেষ হয়ে যাবে
আর যারা বিমর্ষ ছিল তারা আনন্দিত হয়ে যাবে...

হ্যাঁ, আল্লাহ্*র কসম। এটা তো একটি ঘণ্টা মাত্র, তার পর যাদেরকে কষ্ট দেয়া হয়েছিল তারা আর কষ্ট অনুভব করবে না, যারা দুঃখী ছিল তারা আর কোনো দুঃখ অনুভব করবে না, আর যাদেরকে অবসন্ন করা হয়েছিল তারা আর কোনো ক্লান্তি বোধ করবে না।

আমাদের বন্ধুটি পরিণত হয়ে ছিল তাওহীদের সিংহপুরুষদের মধ্যে একজন সিংহপুরুষে, আর সে পরিণত হয়েছিল নির্ভেজাল তাওহীদের দিকে আহ্বাকারী এক আলোকবর্তিকায়। কতজন কয়েদীই না তার দ্বারা সঠিক পথের সন্ধান পেয়েছিল এবং শ্রেষ্ঠ ভাই ও আল্লাহ্*র দিকে আহবানকারীতে পরিণত হয়েছিল।

আমি স্মরণ করি একজন কাফেরের কথা যে ছল কুফর, ফাসাদ ও পাপকার্যের প্রধান, যাকে কারাগারের সকলেই ভয় পেতো। আল্লাহ্* তাওহীদের এই আহবানের দ্বারা তার হৃদয়কে উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন এবং যখন সে সত্যের সন্ধান পেয়েছিল সে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল এবং যারা তার নিকটবর্তী ছিল – কয়েদীরা ও প্রহরীরা – তাদেরকে উদ্দেশ্য করে সে বলেছিলঃ ''শোনো!! আজকে আল্লাহ্* আমাকে হেদায়াত দান করেছেন, আর আমি কারো কাছ থেকে আল্লাহ্* ও তাঁর দ্বীনের প্রতি অবমাননা সহ্য করবো না।

যদি আমি কাউকে এটা করতে শুনি, তাহলে মুখের উপর চড় কষাবো।''

এই বাক্যগুলো বলা হয়েছিল কুফরের প্রধান ও নিকৃষ্টতম অপরাধীদের প্রতি, আর সে কোনো ভ্রূক্ষেপই করে নি। সে সে পূর্বে ছিল বাতিলের উপর অটল, কিন্তু এখন সে একইভাবে কোরআনকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরলো। এখন সে যদি কোরআনের আয়াত তাওহীদের আহবান শ্রবণ করে, আপনি তাকে দেখতে পাবেন সে ছোট বাচ্চার মতো কাঁদছে।

কতজনই না আমদের এই বন্ধুটির দ্বারা আর তার মতো আরো অনেকের দ্বারাই সৎপথের সন্ধান পেয়েছিল! আমার এখনো মনে পড়ে যে, কিভাবে তার হাতে হেদায়েতপ্রাপ্ত হয়েছিল এমন কিছু ভাই একদিন আনন্দের সাথে আমাকে বলছিল যে, কিভাবে তাদের এউনিটের প্রায় ত্রিশজন কয়েদী এখন নামাজ পড়ছে এবং সঠিক পন্থায় জীবন যাপন করছে, আর তাদের অধিকাংশই আবু মুআযের আহবানের দ্বারা। আল্লাহ্* আপনাকে ও আপনার ভাইদেরকে অবিচল রাখুন, হে আবু মুআয।

একদিন সকালে এক লেফটেন্যান্ট এবং তাঁর আফিসাররা রুটিনমাফিক তল্লাশীর জন্য ইউনিটে প্রবেশ করলো। আবু মুআযের ইউনিটের অল্প কিছু মানুষ ছাড়া আর কেউই তাদের সম্মানার্থে উঠে দাঁড়ালো না। কতই না অদ্ভুত নতুন এই দৃশ্য! তারা সাধারণ এই ইউনিটকে নির্বাচন করতো এর অধিবাসীদের প্রতি কৃত ঘৃন্য অভিযোগের কারণে।

তাহলে এই ইউনিটের মানুষগুলো এরূপ আচরণের সাহস কোত্থেকে পেলো?
অফিসারটি জানতো তাদের প্রধান কে, তাই সে পূর্বের ন্যায় উপহাসের ভঙ্গিতে তার দিকে অগ্রসর হলো তাকে অপমানিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে। আগে থেকেই উত্তর জানা সত্ত্বেও সে তাকে প্রশ্ন করা শুরু করলো।
‘‘ তোমার বিরূদ্ধে অভিযোগ কি?’’
আবু মুআয উত্তর দিলো, ‘‘ধর্ষণ।’’
এরপর সে ক্রূর বিদ্রূপের ছলে বললো, ‘‘ছেলে না মেয়ে?’’

আবু মুআয পরিষ্কার ও সোজা ভাষায় উত্তর দিলো, আর সে যা বলতে যাচ্ছে তার পরিণতির প্রতি সে ভ্রূক্ষেপও করে নি,

‘‘যাই হোক না কেন, এটা তুমি যে শিরকের উপর প্রতিষ্ঠিত আছো তার মতো জঘন্য নয়।’’

আল্লাহ্ আপনাকে অবিচল রাখুন, হে আবু মুআয। আল্লাহ্র কসম, এটা তো আর মাত্র কয়েকদিন...

এবং নিজেকে বলো আনন্দ আহরণ করতে এক ঘণ্টার ধৈর্য দ্বারা

পরিশেষে যারা কঠোর পরিশ্রম করেছিল তারা ক্লান্তি ভুলে যাবে

এটা তো কেবল একটি ঘণ্টা মাত্র, আর তা শেষ হয়ে যাবে

আর যারা বিমর্ষ ছিল তারা আনন্দিত হয়ে যাবে...

....

(১)দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের সাথে আখিরাতের চিরস্থায়ী জীবনের কোনো তুলনা চলে না। আখিরাতের জীবনের জন্য আল্লাহ্ যে সুখ-শান্তিময় জান্নাত এবং প্রচন্ড যন্ত্রণাময় জাহান্নাম তৈরি করে রেখেছেন তার সাথে পার্থিব আনন্দ-বেদনার কোনো তুলনা চলে না।

দুনিয়ার জীবনে কোনো মুমিন বান্দা কোনো দুঃখ-কষ্ট পেয়ে থাকলেও জান্নাতে প্রবেশের সাথে সাথে সেগুলো গ্লানি ও পরিতাপ তাৎক্ষনিক দূরীভূত হবে এবং সীমাহীন আনন্দে তারা জীবন ভরে উঠবে। অপরদিকে দুনিয়ার কোনো অকৃতজ্ঞ আল্লাহদ্রোহি বান্দা কোনো সুখ-শান্তি পেয়ে থাকলেও জাহান্নামে প্রবেশের সাথে সাথে সেগুলোর সন্তুষ্টি ও তৃপ্তি তাৎক্ষণিক দূরীভূত হবে এবং সীমাহীন যন্ত্রনায় তার জীবন ভরে উঠবে।